এই সময়
* কথাসরিৎ *

গণতন্ত্রের একমাত্র স্বপ্ন হল, বুর্জোয়ারা নির্বুদ্ধিতার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেখানে কী ভাবে প্রোলেতারিয়েতকে নিয়ে আসা যায়।
— গুস্তাভ ফ্লবেয়ার

নিকটবর্তী

আন্তর্জাতিক দুনিয়ার রাজনৈতিক সমীকরণগুলিকে সরল নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা কঠিন। তার সাফল্য, ব্যর্থতা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলি নির্ভর করে প্রেক্ষিত, দৃষ্টিকোণ ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তবের উপর। হেলসিঙ্কিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক এই জটিল সমীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লিখিত বৈঠকের ফলাফল নিয়ে ট্রাম্প, পুতিন, মার্কিন কংগ্রেস এবং মার্কিন রাজনৈতিক মহলের অবস্থান একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথক। মার্কিন রাজনৈতিক মহলে ট্রাম্প কঠোর ভাবে ধিক্কৃত হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে এই বৈঠকে তাঁর আপসকামী অবস্থানের জন্য। যদিও ট্রাম্পের পক্ষে এ ক্ষেত্রে কঠোর হওয়া এই কারণেই কঠিন যে তা তাঁর নিজের নির্বাচনী জয় নিয়েই প্রশ্ন তোলার সমতুল। রুশ মহলে এই বৈঠক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পুতিনের নীতির জয় হিসেবেই চিহ্নিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও ট্রাম্প ও মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যেও দৃষ্টিকোণের গভীর পার্থক্য। মার্কিন কংগ্রেস সার্বিক ভাবে রাশিয়াকে মার্কিন স্বার্থের প্রতিপক্ষ মনে করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর।

প্রশ্ন হল এমতাবস্থায় নয়া দিল্লির অবস্থান কী হওয়া উচিত? বাস্তব এটাই যে ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে এই সুসম্পর্ক নয়া দিল্লির কাছে সুবর্ণ সুযোগ। রাশিয়া ও ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘকালীন, বহুমাত্রিক এবং গভীর। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সুসম্পর্ক অটুট রাখা নয়া দিল্লির কাছে কোনও অংশে কম জরুরি নয়। এই মুহূর্তে এ ক্ষেত্রে ভারতের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ, সে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না করেও রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ প্রতিরক্ষা মিসাইল ব্যবস্থা কিনতে সফল হওয়া। এই মিসাইল চুক্তির পথে প্রধান বাধা হল, এই চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে একটি বিশেষ মার্কিন আইনের দরুণ ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধ লাগু হওয়ার আশঙ্কা। 'কাটসা' নামের এই আইনটি যাতে ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয় সেই ছাড় সুনিশ্চিত করাই বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। হেলসিঙ্কির বৈঠকে ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে নৈকট্যের ইঙ্গিত মিলেছে। বিচক্ষণ বিদেশনীতির মাধ্যমে নয়া দিল্লি তাকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে সফল হয় কি না সেটিই অতঃপর দ্রষ্টব্য।

নিষেধ

সিগারেটের প্যাকেটে সতর্কতামূলক ছবি দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিটির বিরোধিতা করে সিগারেট উৎপাদক সংস্থাগুলি শীর্ষ আদালতের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, এত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যদি ব্যবসা করতে হয়, তা হলে তো সিগারেটের উপরই নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই হয়, ব্যবসা বন্ধ করাই তো সহজতম সমাধান! সংস্থাগুলির বক্তব্য, সংবিধানের ১৯ (১) ধারা অনুযায়ী, স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করা একটি স্বীকৃত অধিকার। যেটি তাদের সওয়ালে অনুক্ত তা হল, ক্রেতারও অধিকার আছে, যে জিনিসটি কিনছেন, সেই পণ্যটি সম্পর্কে জানার। বস্তুত নির্দেশটি হল, সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে এমন ছবি

বামফ্রন্টের তুলনায় তৃণমূল মন্ত্রিসভায় দলিত, আদিবাসী, মুসলিম ও নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি

কেন তৃণমূল এত ভোট পায়, ভেবেছেন কমরেড?

এক দিকে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের নেতৃত্বে স্থান দেওয়া। অন্য দিকে মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, যা শাসক দল রেখে চলেছে, এবং যার অভাবে বামেদের ফেসবুকই আশ্রয়। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

শুভ্রজিৎ চক্র

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বাম জমানায়, রাজ্য-রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিন্তু উচ্চবর্ণের ভদ্র সমাজের দাপট বেশি ছিল। এই ভদ্রসমাজে মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের দাপট তো বটেই, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিচারে এই ভদ্রসমাজের সদস্যরা মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী পরিবার থেকে আগত। যাঁদের, ভদ্রসমাজের একটা অংশ 'ছোটোলোক' বলে টিপ্পনি করে, অথচ যাঁদের ছাড়া ভদ্র বাবু-বিবিদের আরামদায়ক জীবন একদমই চলবে না, তাঁদের রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃত্বে তেমন একটা দেখা যেত না। রাজ্য-রাজনীতি যখন পুরাতন আমলের বামফ্রন্টীয় সিস্টেম থেকে তৃণমূল সিস্টেমে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন রাজ্য ও জেলা স্তরে পুরাতন আমলের ভদ্র সমাজের দাপট থেকে মুক্ত হয়ে রাজনীতি এক নতুন সমাজের করায়ত্ত হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় যেখানে সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি (২০১১ আদমশুমারির শতাংশের বিচারে মুর্শিদাবাদে ৬৬.৩, মালদায় ৫১.৩ ও উত্তর দিনাজপুরে ৪৯.৯) সেখানে বামফ্রন্টের সব থেকে বড়ো শরিক কবে কোন সংখ্যালঘু নেতাকে ওই সব জেলার পার্টি সম্পাদক করেছিল তা মনে করা কঠিন। অথচ ওই জেলাগুলো থেকে কিন্তু বামফ্রন্টের বেশ কয়েকজন যোগ্য সাংসদ ও বিধায়ক হয়েছিলেন যাঁরা সংখ্যালঘু। শেষ লোকসভা নির্বাচনেও সিপিআই(এম)-এর দুই সাংসদই সংখ্যালঘু এবং মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে নির্বাচিত। একই কথা বলা যেতে পারে বীরভূম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পর্কে যেখানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার সংখ্যালঘু মানুষ বাস করেন (বীরভূমে ৩৭.১ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ৩৫.৬ শতাংশ)। এর সঙ্গে বীরভূম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাগুলোয় যদি দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে যোগ করা যায় যা এই দুটি জেলায় ৩০ শতাংশের বেশি, দেখা যাচ্ছে যে তা সত্ত্বেও সিপিআই(এম) কিন্তু বরাবর এই সব জেলায় উচ্চবর্ণের মানুষকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়েছে।

যাঁরা রাজ্য-রাজনীতির হাঁড়ির খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সিপিআই(এম) পার্টি সংগঠনের এক বড়ো অংশ, রাজ্যের ডাকাবুকো একজন মন্ত্রীকে জেলা সম্পাদক করতে চেয়েছিল। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু কৃষক নেতার পরিচয়ে বেশি পরিচিত। এই রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের যে দুটো সব থেকে বড়ো পরিচিতি— এক দিকে সে 'বাঙালি' আর অন্য দিকে সে 'কৃষক', তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সিপিআই(এম)-এর উচ্চতর পার্টি নেতৃত্ব নিচুতলার কর্মীদের কথা মানলেন না। তার কিছু দিন পর আরও অনেক মতপার্থক্যের কারণে তিনি পার্টি ছাড়লেন (ক্ষমা করবেন! কমিউনিস্ট পার্টি তো ছাড়া যায় না, ওখান থেকে বিতাড়িত হতে হয়)। এখন তিনি তৃণমূল আমলে মন্ত্রী হয়েছেন, জনপ্রিয়তার নিরিখে মানুষের ভোটে তিনি রেকর্ড টানা দশবার বিধায়ক হলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে যখন পার্টি সংগঠন সংসদীয় রাজনীতির থেকে বেশি গুরুত্ব পায়, বামেরা কি সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষের মধ্যে যোগ্য মানুষের অভাব দেখেছিলেন? রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিতে সামাজিক ইস্যুগুলো তেমন গুরুত্ব পায় না বলে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার সিপিআই(এম)-এর এক প্রাক্তন সাংসদ পার্টি ত্যাগ করেছেন। অথচ রাজ্যের শাসক দল মালদা জেলায় এক সংখ্যালঘু নেতাকে পার্টির জেলা সভাপতি করেছে এবং গত বছর, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আরও এক সংখ্যালঘু নেতা মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। বীরভূম জেলায় কোনও উচ্চবর্ণের মানুষকে তৃণমূল সভাপতি করেনি।

২৩৫ আসনের বুক-ঠোকা ৪৪ সদস্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে যদি ২১১ আসনের তৃণমূলের ৪২ সদস্যের মন্ত্রিসভার সামাজিক পরিচয়-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৬ সালের বামফ্রন্টে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৬.৮১ শতাংশ। ২০১৬ সালের তৃণমূল আমলের রাজ্য মন্ত্রিসভায় মহিলা প্রতিনিধি হল ১১.৯০ শতাংশ। সংখ্যাটা দলিতদের ক্ষেত্রে ২০০৬ সালে ছিল ১৫.৯০ শতাংশ, আদিবাসী ছিল ৪.৫৪ শতাংশ আর মুসলিম ছিল ১১.৩৬ শতাংশ। ২০১৬ সালের তৃণমূল মন্ত্রিসভায় দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধির সংখ্যা যথাক্রমে বেড়ে হয়েছে ১৬.৬৬, ৭.১৪ এবং ১৬.৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে তৃণমূল মন্ত্রিসভায়, ২০০৬ সালের বাম আমলের তুলনায় বিধায়ক এবং মন্ত্রী সংখ্যা, তৃণমূলের কম থাকা স্বত্ত্বেও। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের তুলনায় তৃণমূল তিনটে বিষয়ে ভিন্ন। প্রথমত, তৃণমূল অনেক বেশি রাজ্য-কেন্দ্রিক ইস্যু নিয়ে চিন্তিত। বামেরা তাদের বিভিন্ন প্রদেশের 'লবির' দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তৃণমূল অপেক্ষাকৃত সাবল্টার্ন (নিম্নবর্গীয়)। তৃতীয়ত, বামেদের সংগঠিত শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির তুলনায় সংখ্যায় বিপুল, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষকে ম্যানেজ করার বিষয়ে তৃণমূল অধিক পটু।

> পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের তুলনায় তৃণমূল তিনটে বিষয়ে ভিন্ন। প্রথমত, তৃণমূল অনেক বেশি রাজ্য-কেন্দ্রিক ইস্যু নিয়ে চিন্তিত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তৃণমূল অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয়। তৃতীয়ত, বামেদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষকে ম্যানেজ করার বিষয়ে তৃণমূল অধিক পটু।

বামফ্রন্টীয় রাজনীতি ও মতাদর্শে যাঁরা আজীবন বিশ্বাস করতেন, তাঁরা প্রধানত গরিব এবং প্রান্তিক মানুষদের স্বার্থ দেখার দাবি করে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই পার্টি বহু দিন আগেই তাদের স্বার্থ দেখার চেয়ে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। মতাদর্শগত ভাবে বিচার করলে সেই পার্টির দলিলগুলোয় এবং সেই পার্টির নামের মধ্যে যতই বিপ্লবী কথা লেখা থাকুক না কেন, অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় অন্তত এই রাজ্যে, রাজনৈতিক অনুশীলনের নিরিখে তারা একটি গড়পড়তা উদারবাদী এবং কিছু ক্ষেত্রে মধ্য-দক্ষিণপন্থী অবস্থান নিচ্ছিল। সেই প্রবণতা ২০০১ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং ২০০৬ সালের পর থেকে তা আরও গতি পায়। ভারতের সব থেকে নির্ভরশীল নির্বাচনী সমীক্ষা, সিএসডিএস-এর তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের তুলনায় ২০০৬ সালে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে বামফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন বেড়েছিল ১৬ ও ১৮ শতাংশ আর গ্রামীণ গরিবের মধ্যে তাদের সমর্থন কমেছিল ৫ শতাংশ। সেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের খুশি করতে গিয়ে বাংলার সিপিআই(এম)-র আম ও ছালা, দুটোই গেল। বামফ্রন্ট নেতৃত্ব এক দিকে দম্ভের উপর ভর করে আর এক দিকে পার্টি সংগঠনকে দমবন্ধ অবস্থায় রেখে মানুষকে সঠিক মর্যাদা না দিলে যে কী হয়, সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছে। আর ২০১৬ সাল থেকে তো আরও পরিষ্কার হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, যা বর্তমান শাসক দল এবং বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত করে চলেছেন, তা না রাখলে শুধু টিভি চ্যানেলে ও ফেসবুকে থাকা যায়, মানুষের বুকে স্থান পাওয়া যায় না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ (সবাই নয়) সুবিধাবাদী। বাংলার রাজনীতিতে এরা গরিব মানুষের তুলনায় দ্রুত রাজনৈতিক শিবির পাল্টায়। বাম আমলে মধ্যবিত্তদের একটি বড়ো অংশ প্রথম পনেরো বছর বামেদের ভোট দিয়ে ১৯৯০-এর দশকে নব-উদারবাদের জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে বামেদের ত্যাগ করে। সাহিত্যপ্রেমী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা আবার বামেদের দিকে ফিরে আসে। ঠিক পর মুহূর্তে তারা আবার বর্তমান শাসক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয় কয়েক বছর। আবার এখন তারা কিন্তু-কিন্তু করছে এবং বাংলায় 'কিসসু হচ্ছে না' গোছের বিলাপ করছে। অথচ বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কী করা প্রয়োজন সেগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না। অন্য দিকে প্রবাসী এবং অনাবাসী বাঙালি, বাংলায় যদি কিছু পুঁজি ঢালে যেটা বর্তমান বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে তা হলেও কিছু হয়, প্রবাসে থেকে বাংলায় কিছু হচ্ছে না গোছের গেল-গেল রব না তুলে কিংবা শীতের পরিযায়ী পাখী হয়ে (অনেকে আবার গরমের ছুটিতেও) বাংলায় কী করতে হবে সেই সব বাণী না দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা নিত্য দিন বাড়ছে। কাজের অভাবে গ্রাম, শহর ও মফস্সলে কিছু জমি মাফিয়া, তোলাবাজ এবং নানাবিধ অসামাজিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত এক লুম্পেন শ্রেণি, যারা বাম আমলেও ছিল, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে এই শ্রেণি ঢুকে পড়ছে। তাই রাজনীতি-কেন্দ্রিক মারামারি-হানাহানি লেগেই রয়েছে। টেলিভিশন মিডিয়ার দৌলতে সেগুলো মধ্যবিত্তের বসার ঘরে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা আড্ডার খোরাকও হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-অর্থনীতির কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন না ঘটলে এই রাজনৈতিক হিংসার ধারা অব্যাহত থাকবে, যে দলই রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকুক না কেন।

সংবেদনশীল মানুষ রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে সরব হবেন, বিবেকের দংশন থেকে এহেন কুকীর্তিকে নিন্দা করবেন অবশ্যই কিন্তু কেবল আইনশৃঙ্খলাকে দায়ী করে রাজনৈতিক হিংসার ব্যাখ্যা করা যায় না। একটি শাসনপ্রণালীকে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী মান্যতা দিচ্ছেন কিনা, তার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সাধারণ মানুষ একটি সরকারকে কেন বিভিন্ন নির্বাচনে বিপুল ভোট দিচ্ছে। সব নির্বাচনে শুধু রিগিং হচ্ছে, যা বামফ্রন্ট আমলেও বিরোধীরা বলত, তা কোনও সিরিয়াস বিশ্লেষণ হতে পারে না।

কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, পর্যটন, বস্ত্রশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, ট্যানারি করে কিছু করা যায়। এগুলোর জন্য বেশি জমিও লাগে না। অথচ শ্রমনিবিড় কিছু শিল্প হয়। রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান হয়। এগুলো না হলে সমগ্র পূর্ব ভারতের এক তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক উদ্বৃত্ত শ্রমিকের চাপ নিয়ে আমাদের রাজ্যের নিজস্ব উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সামলানো সহজ কথা নয়। উপরি-উক্ত সামাজিক চাপ ও দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজনৈতিক হিংসা বাড়লে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মধ্যেও এক প্রকারের মানুষ আছেন যাদের অন্য কোনও কাজ না থাকার ফলে তাদের সময়ও উদ্বৃত্ত। অসুখী মন এবং আকাশকুসুম আকাঙ্খা পুরণ না হবার কারণে আরও অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে তাঁরা তেলের ঊর্ধ্বগামী দাম ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় লোকের জীবনে কী হচ্ছে তা নিয়ে বিশেষ চর্চা করেন। নিজের চরকায় তেল দেওয়া যাকে ইংরেজিতে বলে 'অয়েল ইওর ওন মেশিন', তাঁদের ধাতে নেই।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক